বেদনায় ভরা দিন
- শেখ হাসিনা

রোড ৩২, ধানমন্ডি

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। দূরের মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে। এমন সময় প্রচন্ড গোলাগুলির আওয়াজ। এ গোলাগুলির আওয়াজ ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের একটি বাড়ি ঘিরে, যে বাড়িতে বসবাস করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এক বিঘা জমির উপর খুবই সাধারণ মানের ছোট্ট একটা বাড়ি। মধ্যবিত্ত মানুষের মতই সেখানে বসবাস করেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি সবসময়ই সাধারণ জীবনযাপন করতেন। এই বাড়ি থেকেই ১৯৭১ সালের ২৬-এ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের যে আন্দোলন-সংগ্রাম - এই বাড়িটি তার নীরব সাক্ষী। সেই বাড়িটিই হলো আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। গোলাগুলির আওয়াজের মধ্যে আযানের ধ্বনি হারিয়ে যায়।

রাষ্ট্রপতির বাসভবনের নিরাপত্তায় সাধারণত সেনাবাহিনীর ইনফেন্ট্রি ডিভিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু মাত্র ১০-১২ দিন পূর্বে বেঙ্গল ল্যাঞ্চারের অফিসার ও সৈনিকদের এ দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমার মা, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, লক্ষ্য করলেন কালো পোশাকধারী সৈনিকেরা বাড়ির পাহারায় নিয়োজিত। তিনি প্রশ্নটা তুলেছিলেনও। কিন্তু কোন সদুত্তর পাননি।

আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছিল দেশের মানুষের প্রতি অঢেল ভালোবাসা। তিনি সকলকেই অন্ধের মত বিশ্বাস করতেন। তিনি কখনও এটা ভাবতেও পারেননি যে, কোন বাঙালি তাঁর ওপর গুলি চালাতে পারে বা তাঁকে হত্যা করতে পারে। তাঁকে বাঙালি কখনও মারবে না, ক্ষতি করবে না - এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি চলতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, সেই বিশ্বাসের কি মূল্য তিনি পেয়েছিলেন?

চারদিকে মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ। বিকট শব্দে মেশিনগান হতে গুলি করতে করতে মিলিটারি গাড়ি এসে দাঁড়ালো ৩২ নম্বর রোডের বাড়ির সামনে। গুলির আওয়াজে ততক্ষণে বাড়ির সকলেই জেগে উঠেছে। আমার ভাই শেখ কামাল দ্রুত নিচে নেমে গেল রিসেপশন রুমে - কারা আক্রমণ করলো, কী ঘটনা জানতে। বাবার ব্যক্তিগত সহকারী মহিতুল ইসলাম বিভিন্ন জায়গায় ফোন করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কোন সাড়া পাচ্ছিলেন না।

সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর কামাল বেরিয়ে বারান্দায় এসে দেখে বাড়ির গেট দিয়ে মেজর নূর ও ক্যাপ্টেন হুদা এগিয়ে আসছে। কামাল তাদের দেখেই বলতে শুরু করলো: আপনারা এসে গেছেন, দেখেন তো কারা বাড়ি আক্রমণ করলো?

ওর কথা শেষ হতে পারলো না। তাদের হাতের অস্ত্র গর্জে উঠলো। কামাল সেখানেই লুটিয়ে পড়লো। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর নূর আর কামাল একইসঙ্গে কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। আর সেই কারণে ওরা একে অপরকে ভালোভাবে চিনতো। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! সে চেনা মানুষগুলি কেমন অচেনা ঘাতকের চেহারায় আবির্ভূত হলো। নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করলো সহযোদ্ধা কামালকে। কামাল তো মুক্তিযোদ্ধা। দেরাদুন থেকে ট্রেনিং নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে যায় যুদ্ধ করতে। এরপর বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন শেখ কামালকে নিয়োগ দেয় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী প্রধান কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসেবে।

মেজর সৈয়দ ফারুক ট্যাঙ্ক নিয়ে আমাদের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। আব্বা সবার আগে ঘর থেকে সেনাবাহিনী প্রধান সফিউল্লাহ সাহেবকে ফোন করেন। তাঁকে জানান বাড়ি আক্রান্ত। তিনি জবাব দেন: আমি দেখছি। আপনি পারলে বাইরে কোথাও চলে যান।

এর মধ্যে ফোন বেজে ওঠে। কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রব সেরিয়াবাত, আমার সেজ ফুফা, ফোনে জানান যে তাঁর বাড়ি কারা যেন আক্রমণ করেছে। আব্বা জবাব দেন তাঁর বাড়িও আক্রান্ত। আব্বা আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদকে ফোন করেন। আব্দুর রাজ্জাক বলেন: লিডার দেখি কী করা যায়। আব্দুর রাজ্জাক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। তোফায়েল আহমেদ ফোনে বলেন: আমি দেখছি। রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে বলতে থাকেন: আমি কী করবো? তোফায়েল আহমেদ রক্ষী বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। আব্বা নিচে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হন। মা পাঞ্জাবিটা পরিয়ে দেন। আব্বা যেতে যেতে - কামাল কোথায় - জিজ্ঞেস করতে থাকেন। কথা বলতে বলতে তিনি সিঁড়ির কাছে পৌঁছান।

এ সময় সিড়ির মাঝের প্ল্যাটফর্মে যারা দাঁড়িয়েছিল তারাও দোতালায় উঠে আসছিল। এদের মধ্যে হুদাকে চিনতে পারেন আব্বা। আব্বা তার বাবার নাম ধরে বলেন: তুমি রিয়াজের ছেলে না? কী চাস তোরা? কথা শেষ করতে না করতেই গর্জে উঠে ওদের হাতের অস্ত্র। তাদের সঙ্গে ইতোমধ্যেই যোগ দিয়েছিল রিসালদার মোসলেউদ্দিন।

ঘাতকদের নির্মম বুলেটের আঘাতে সিঁড়ির উপর লুকিয়ে পড়লেন আব্বা। আমার মা সিড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘাতকের দল ততক্ষণে ওপরে উঠে এসেছে। আমার মাকে তারা বাধা দিল এবং বললো যে আপনি আমাদের সঙ্গে চলেন। মা বললেন: আমি এক পা-ও নড়বো না, কোথাও যাবো না। তোমরা উনাকে মারলে কেন? আমাকেও মেরে ফেলো। ঘাতকদের হাতের অস্ত্র গর্জে উঠলো। আমার মা লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল ও জামালের স্ত্রী রোজী জামাল মা'র ঘরে ছিল। সেখানেই তাঁদের গুলি করে হত্যা করে ঘাতকেরা। রাসেলকে রমা জড়িয়ে ধরে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। ছোট্ট রাসেল কিছুই বুঝতে পারছে না। একজন সৈনিক রাসেল আর রমাকে ধরে নিচের তলায় নিয়ে যায়। একইসঙ্গে বাড়িতে আরও যারা ছিল তাদেরও নিচে নিয়ে দাঁড় করায়।

গৃহকর্মী আব্দুল গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। তাকেও নিয়ে যায়। বাড়ির সামনে আম গাছতলায় সকলকে দাঁড় করিয়ে একে একে পরিচয় জিজ্ঞেস করে। আমার একমাত্র চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের পঙ্গু ছিলেন। তিনি বার বার মিনতি করছিলেন: আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা; আমি মুক্তিযোদ্ধা। আমাকে মেরো না। ছোট ছোট বাচ্চারা আমার, ওদের কী হবে? কিন্তু খুনিরা কোন কথাই কানে নেয় না। তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকে অফিস ঘরের বাথরুমে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

রমার হাত ধরে রাসেল "মা'র কাছে যাব, মা'র কাছে যাব" বলে কান্নাকাটি করছিল। রমা বারবার ওকে বোঝাচ্ছিল: তুমি কেঁদো না ভাই। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু অবুঝ শিশু মায়ের কাছে যাব বলে কেঁদেই চলছে। এ সময় একজন পরিচয় জানতে চায়। পরিচয় পেয়ে বলে: চলো, তোমাকে মায়ের কাছে দিয়ে আসি।

ভাইয়ের লাশ, বাবার লাশ মাড়িয়ে রাসেলকে টানতে টানতে দোতলায় নিয়ে মায়ের লাশের পাশেই গুলি করে হত্যা করে। দশ বছরের ছোট্ট শিশুটাকে ঘাতকের দল বাঁচতে দিল না।

যে বাড়ি থেকে একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেই বাড়িটি রক্তে ভেসে গেল। সেই রক্তের ধারা ওই সিঁড়ি বেয়ে বাংলার মাটিতে মিশে গেছে- যে মাটির মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন।

৪৬ ব্রিগেডের দায়িত্বে ছিলেন সাফায়েত জামিল। সেনাপ্রধান তাঁকে ফোন করে পায়নি। সিজিএস খালেদ মোশাররফও কোন দায়িত্ব পালন করেনি। সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ জিয়াউর রহমান কোন ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করেনি বরং সে পুরো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। খুনি রশিদ ও ফারুক বিবিসি-তে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জিয়াউর রহমানের জড়িত থাকার কথা বলেছে। খুনি মোস্তাক জিয়াকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়। ঢাকার তৎকালীন এসপি মাহবুবকেও ফোন করে পাওয়া যায়নি।

মেজ ফুপুর বাসা

ঘাতকেরা ধানমন্ডির মেজ ফুফুর বাড়ি আক্রমণ করে রিসালদার মোসলেউদ্দিনের নেতৃত্বে। তাদের একটি দল সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে গালি দিতে থাকে। বুটের আওয়াজ আর চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে মুক্তিযোদ্ধা যুবনেতা এবং বাংলার বাণীর সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বন্দুক তাক করে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকে ঘাতকের দল। এ সময় তাঁর অন্তঃসত্তা স্ত্রী আরজু ছুটে এসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ঘাতকদের বুলেট থেকে বাঁচাতে। কিন্তু ঘাতকের দল তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি করে। বুলেটের আঘাতে দুজনের শরীর ঝাঝরা হয়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নিথর দেহ দুটি। ছোট দুই ছেলে, তিন বছরের তাপস আর বছর পাঁচেকের পরশ, মা-বাবার লাশের পাশে এসে চিৎকার করতে থাকে আর বলতে থাকে: মা ওঠো, বাবা ওঠো। ঐ শিশুদের কান্না মা-বাবা কি শুনতে পেয়েছিল? ততক্ষণে তাঁরা তো না-ফেরার দেশে চলে গেছে। শিশুদের চোখের পানি মা-বাবার রক্তের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়।

সেজ ফুপুর বাড়ি

গুলি করতে করতে মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান ও মেজর এ এম রাশেদ চৌধুরী মিন্টু রোডে সেজ ফুফার সরকারি বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে যায়। পরিবারের সকল সদস্যকে তাঁদের ঘর থেকে বের করে নিচতলায় বসার ঘরে নিয়ে আসে। এর পর তাদের উপর ব্রাশ ফায়ার করে। গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়েন আবার ফুপু আমিনা সেরনিয়াবাত, আমার ফুফা কৃষিমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব সেরিয়াবাত, তাঁর মেয়ে বিউটি, বেবি, রিনা, ছেলে খোকন, আরিফ, বড় ছেলে আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর স্ত্রী শাহানা, নাতি সুকান্ত, ভাইয়ের ছেলে মুক্তিযোদ্ধা শহীদ, ভাগ্নে রেন্টু। আট বছরের নাতনি কান্তা গুলিবিদ্ধ লাশের নিচে চাপা পড়ে যাওয়ায় বেঁচে যায়। দেড় বছরের নাতি সাদেক গুলিবিদ্ধ মায়ের বুকে পড়ে কাঁদতে থাকে। আট বছরের কান্তা নিজের ফুফু বেবির লাশের নিচে চাপা পড়েছিল। সেখান থেকে কোন মতে বের হয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। সারি সারি গুলিবিদ্ধ আপনজন পড়ে আছে। কারও নিথর দেহ, কেউ বা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। ঘরের কোণায় রাখা অ্যাকুরিয়াম গুলি লেগে ভেঙে যায়। অ্যাকুরিয়ামের পানির সঙ্গে মাছগুলি মাটিতে পড়ে যায়। রক্ত ভেজা পানিতে মাছগুলিও ছটফট করে লাফাতে থাকে। কিছুক্ষণ আগে যে আপনজন মা, বাবা, দাদা-দাদি, চাচা, ফুফুসহ সকলকে নিয়ে এই শিশুরা ছিল, আর এখন গুলিবিদ্ধ রক্তে ভেজা আপনজন। লাশের নিচ থেকে নিজেকে বের করে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে ৮ বছরের শিশুটি অবাক বিস্ময়ে ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে থাকে।

মেজর ফারুক ট্যাঙ্ক নিয়ে লেকের ওপার থেকে ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবন লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। সেই গুলি মোহাম্মদপুরে এক বাড়িতে পড়ে। সেখানে ১১ জন মানুষ নিহত হয় আরও অনেকেই আহত হয়। মেজর ডালিম রেডিও স্টেশন দখলের দায়িত্বে ছিল।

সেখান থেকেই সে ঘোষণা দেয়: শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। ঘাতকেরা শুধু হত্যা করে তাই নয়, তারা আমাদের বাসা লুটপাট করে। আমার বাবার শোবার ঘরে এবং ড্রেসিং রুমের সকল আলমারি, লকার সবকিছু ভেঙ্গে সেখান থেকে যা কিছু মূল্যবান ছিল - গহনা, ঘড়ি, টাকা-পয়সা লুটপাট করে নিয়ে যায়। বাসায় ব্যবহার করা গাড়িটাও মেজর হুদা ও নূর নিয়ে যায়।

আলমারীর সব কাপড় চোপড় বিছানার ওপর পড়েছিল। সেগুলোর অনেকগুলোতে ছিল রক্তের দাগ। এই হত্যাকান্ডের পর লুটপাটের ঘটনা মনে করিয়ে দেয় ওদের চরিত্রের অন্ধকার দিকটা। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তারা এই সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের কত বড় সর্বনাশ করেছিল তা কি ওরা বুঝতে পেরেছিল?

যে বুকে বাংলার মানুষের জন্য প্রচন্ড ভালোবাসা ছিল, সেই বুকটাই ঝাঁঝরা করে দিল তাঁরই প্রিয় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কিছু দুর্বৃত্ত। আমার আব্বা কোনদিন বিশ্বাস করতেই পারতেন না যে, বাংলাদেশের কোন মানুষ তাঁকে মারতে পারে, বা কোন ক্ষতি করতে পারে। পৃথিবীর অনেক নেতাই তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, ওরা তো আমার ছেলে, আমাকে কেন মারবে? এত বড় বিশ্বাস ভঙ্গ করে ওরা বাঙালির ললাটে কলঙ্ক লেপন করল।

কী বিচিত্র এ দেশ! একদিন যে মানুষটির একটি ডাকে এদেশের মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে বিজয় এনেছিল, বীরের জাতি হিসেবে সারা বিশ্বের কাছে মর্যাদা পেয়েছিল, আজ এই হত্যাকান্ডের মধ্যে দিয়ে সেই জাতি সমগ্র বিশ্বের কাছে বিশ্বাসঘাতক জাতি হিসেবে পরিচিতি পায়। খুনি ও ষড়যন্ত্রকারীদের এদেশের অগণিত জনগণ ঘৃণা করে এবং বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করে।
আমার অন্তঃসত্ত্বা চাচী ছয় জন সন্তান নিয়ে চরম বিপদের সম্মুখীন হন। খুলনায় ভাড়ার বাসায় বসবাস করতেন। সে বাসা থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। টুঙ্গিপাড়ার বাড়িও সিল করে রাখা হয়। ঘরবাড়ি হারা সদ্য বিধবা কোথায় ঠাঁই পাবেন?

সোবহানবাগ

আব্বার সামরিক সচিব কর্নেল জামিল তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িতে করে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে রওয়ানা হন। সোবহানবাগ মসজিদের কাছে তাঁর গাড়ি আটকে দেয় ঘাতকেরা। তিনি এগুতে চাইলে ঘাতকেরা তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে।
আমাদের বাড়ির নিচে পুলিশের বিশেষ শাখার সদস্য এসআই সিদ্দিকুর রহমানকেও তারা গুলি করে হত্যা করে।

বেলজিয়াম

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ...। টেলিফোনটা বেজেই যাচ্ছে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো টেলিফোনের আওয়াজ এত কর্কশ? আমি ঘুম থেকে উঠে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালাম। দেখি নিচে অ্যাম্বাসেডর সানাউল হক সাহেব ফোন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, ওয়াজেদের সঙ্গে কথা বলবেন। আমি তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। অপর পারে জার্মানির অ্যাম্বাসেডর হুমায়ুন রশিদ সাহেব কথা বলছেন। তিনি জানালেন বাংলাদেশে ক্যু হয়েছে। আমার মুখ থেকে বের হল: "তাহলে তো আমাদের আর কেউ বেঁচে নাই"। রেহানা পাশে ছিল। তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু তখনও জানি না কী ঘটনা ঘটেছে।
মাত্র ১৫ দিন আগে জার্মানি এসেছি। বেলজিয়ামে বেড়াতে এসেছি। নেদারল্যান্ডেও গিয়েছিলাম। আব্বা বলেছিলেন, নেদারল্যান্ড কীভাবে সাগর থেকে ভূমি উত্তোলন করে - পারলে একবার দেখে এসো। একদিন আগেই আব্বা-মার সঙ্গে কথা হয়েছে। কেন জানি মা খুব কাঁদছিলেন। বললেন "তোর সাথে আমার অনেক কথা আছে, তুই আসলে আমি বলবো।" আমাদের খুব খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল তখনই দেশে ছুটে চলে যাই।
আব্বা বললেন: রোমানিয়া ও বুলগেরিয়াতে তিনি যাবেন। আর ফেরার পথে আমাদের নিয়ে আসবেন।
কিন্তু আমাদের আর দেশে ফেরা হলো না। একদিন পরই সব শেষ। বেলজিয়ামের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সানাউল হক, যিনি রাজনৈতিক সদিচ্ছায় অ্যাম্বাসেডর পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন, রাতারাতি তার চেহারাটাই পাল্টে গেল। তিনি জার্মানিতে নিয়োজিত রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশিদ সাহেবকে বলেন, যে বিপদ আমার কাঁধে পাঠিয়েছেন তাঁদের ফেরত নেন।
যিনি আগের রাতে আমাদের জন্য 'ক্যান্ডেল লাইট ডিনার' এর আয়োজন করেছিলেন; কত খাতির, আদর-যত্ন, আর এখন আমরা তার কাছে আপদ হয়ে গেলাম। আমাদের বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য গাড়িটাও দিলেন না। বেলজিয়াম অ্যাম্বাসিতে কর্মরত আমার স্কুলের বান্ধবী নমি'র স্বামী জাহাঙ্গীর সাদাতের গাড়িতে করে আমদের বেলজিয়াম বর্ডারে যেতে বললেন। জাহাঙ্গীর সাদাত আমাদের জার্মানির বর্ডারে পৌঁছে দিলেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে নোম্যান্স ল্যান্ড পার হয়ে আমরা জার্মানির মাটিতে পৌঁছলাম। জার্মানির অ্যাম্বাসেডর হুমায়ুন রশিদ সাহেব গাড়ি পাঠিয়েছেন। আর তাঁর স্ত্রী আমার বাচ্চাদের জন্য শুকনো খাবার-দাবারও গাড়িতে দিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে কয়েকদিন আশ্রয় পেলাম। তাঁদের আদর যত্ন দুঃসময়ে আমাদের জন্য অনেক মূল্যবান। আমরা কোনদিন ভুলতে পারবো না হুমায়ুন রশীদ ও তাঁর স্ত্রীর অবদান। জার্মান অ্যাম্বাসির সকল অফিসার ও কর্মচারি আমাদের অত্যন্ত যত্ন করেছিলেন। অ্যাম্বাসির গাড়িতে আমাদের কার্লস রুয়ে পৌঁছে দিলেন। জার্মান সরকার, যগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ আরও অনেকে আমাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে চাইলেন। জার্মানিতে নিযুক্ত ভারতের অ্যাম্বাসেডর জনাব হুমায়ুন রশিদ ও ডক্টর ওয়াজেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমাদের ভারতে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেন। আমরা জার্মানি থেকে ভারতে পৌঁছালাম।

উপসংহার

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের রক্তাক্ত বেদনার আঘাত বুকে ধারণ করে আমার পথচলা। বাবা মা ভাইদের হারিয়ে ৬ বছর পর ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফিরে আসতে পেরেছি। একটি প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছি, যে বাংলাদেশ আমার বাবা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন, তা ব্যর্থ হতে পারে না। লাখো শহিদের রক্ত আর আমার বাবা-মা ভাইদের রক্ত ব্যর্থ হতে আমি দেব না।

আমার চলার পথ খুব সহজ ছিল না, বারবার আমার উপর আঘাত এসেছে। মিথ্যা অপপ্রচার, গুলি, বোমা ও গ্রেনেড হামলার শিকার হতে হয়েছে আমাকে। খুনি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদা জিয়া বিভিন্ন সময় বলেছিল, “শত বছরেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারবে না।” “শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা বিরোধী দলের নেতাও কখনও হতে পারবে না।” এর পরেই তো সেই ভয়াবহ ২০০৪ সালের ২১-এ আগস্টের গ্রেনেড হামলা। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মানবঢাল রচনা করে সেদিন আমাকে রক্ষা করেছিলেন। উপরে আল্লাহ, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী আর বাংলাদেশের জনগণই আমার শক্তি। আমার চলার কন্টকাকীর্ণ পথে এরাই আমাকে সাহায্য করে চলেছেন। তাই আজকের বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত জনগণের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আছে বলেই আজকের বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। বাংলাদেশের জনগণকে ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি দিতে পেরেছি। তারা এখন উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে।

বাবা! তুমি যেখানেই থাক না কেন, তোমার আশীর্বাদের হাত আমার মাথার উপর আছে - আমি তা অনুভব করতে পারি। তোমার স্বপ্ন বাংলাদেশের জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার ব্যবস্থা করে সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। তোমার দেশের মানুষ তোমার গভীর ভালোবাসা পেয়েছে আর এই ভালোবাসার শক্তিই হচ্ছে এগিয়ে যাবার প্রেরণা।

- *বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা।*

পিআইডি ফিচার